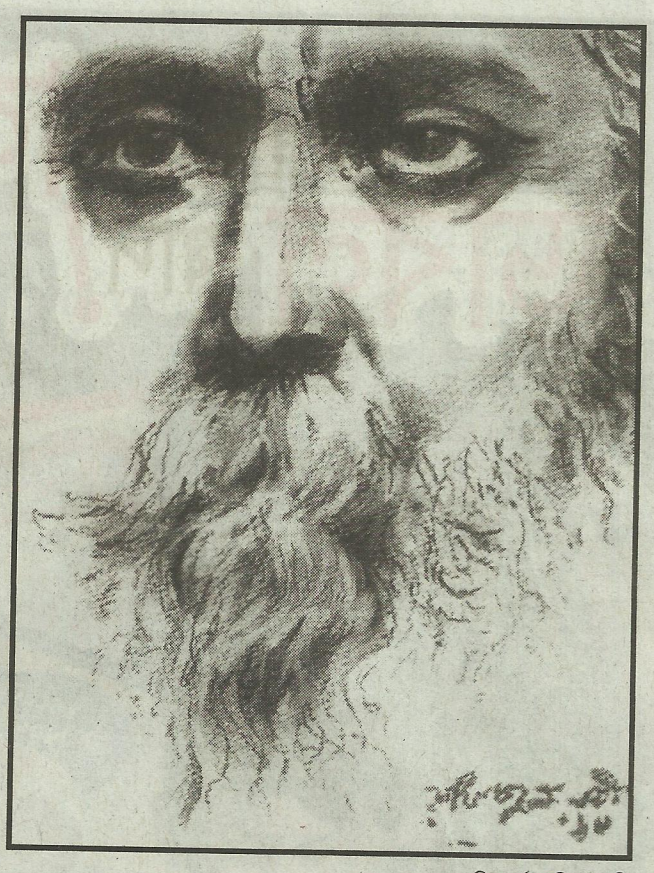

● চিত্রকর্ম : রফিকুন নবী

বিনায়ক সেন

ভিন্নমতের রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্রের সাক্ষ্য

রবীন্দ্রনাথ

ভিন্ন মতের আদর্শ

তিনিই ছিলেন এদেশের আদি 'ডিসিডেন্ট', নিত্য হেনস্তার মুখোমুখি এবং নিঃসঙ্গ ভিন্ন মতাবলম্বী। যুক্তি-তর্কের স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে গিয়ে বহুবার তাকে পঙ্‌ক্তিহারা হতে হয়েছে রাষ্ট্র, ভদ্রসম্প্রদায়, বিচক্ষণ শাসক, স্বদেশ রাজনীতিবিদ, এমনকি তার সহকর্মী সারস্বত বিদ্বৎ সমাজের কাছ থেকে। তারপরও পিছু হটেননি তিনি, যেমনটা তিনি বলেছিলেন বুদ্ধদেব বসুকে, 'তোমাদের ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে আমিও কোমর বেঁধে লাগব বাড়াবাড়ি করতে।' এই উদাহরণটি অবশ্য নিজেদের ভেতরে মতপার্থক্যের, কিন্তু এর চেয়ে আরও তীব্র মতাদর্শগত লড়াইয়ে তাকে অনেকবার প্রবেশ করতে হয়েছে। বিভিন্ন বাদানুবাদে জড়িয়ে মানসিক ও সামাজিকভাবে তাকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল জীবনের নানা পর্যায়েই। তারপরও স্বভূমি তিনি আঁকড়ে ছিলেন। সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিল্পকলা এক রকম নানা বিষয়ে বাঁধা মতের বাইরে গিয়ে– অনেক ক্ষেত্রে প্রথাগত 'জ্ঞানকাণ্ডের কর্তৃত্ব' অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ তার একান্ত নিজস্ব একটি বক্তব্য, নিজস্ব একটি ধারণা/দর্শন গড়ে তুলছিলেন। এ অনেকটা যেন চলতি প্যারাডাইমের খড়ির গণ্ডির বাইরে গিয়ে দাঁড়ানো, যেখান থেকে চেনা ক্ষেত্রকেও অচেনা মনে হয়। একেই আমরা বলছি বিকল্পের নির্মাণ। ছকের বাইরে গিয়ে ভিন্ন মত ও পথ ধরে ভাবা, বলা ও করার জন্য এক ক্ষান্তিহীন অকৃত্রিম চেষ্টা আমরা রবীন্দ্রনাথে দেখতে পাই। সবকিছুকে প্রশ্ন করা এবং সবকিছুতে প্রথাবিরোধী

ORION GROUP

হয়ে বিকল্পকে খুঁজে ফেরা– রবীন্দ্রনাথের এই 'ডিসিডেন্ট' আদর্শের প্রতি আবারও দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন– এটাই এই লেখাটির মূল বক্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন মতের চর্চাকে সচরাচরের বাম-ডান কোন তকমাতেই আবদ্ধ করা চলে না। কেননা ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি বিকল্প খুঁজে বেড়াচ্ছেন কোন পূর্ব-নির্ধারিত মতাদর্শ থেকে প্ররোচিত হয়ে নয়। কাদম্বিনী দেবীকে লেখা ১৯১০ সালের একটি চিঠিতে তার ব্যক্তিগত সাফাইটা এ রকম : 'যখন থেকে আমি আমার জীবনের গভীরতম প্রয়োজনে আমার অন্তরতর প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যাকুলতার প্রেরণায় সাধনার পথে প্রবৃত্ত হলুম তখন থেকে আমার পক্ষে যা বাধা তা বর্জন করতেই হয়েছে এবং যা অনুকূল তাই গ্রহণ করেছি। কোন আচার, মতাদর্শ বা তত্ত্বকেই তিনি এক কথায় ছুড়ে ফেলার বা একবাক্যে মেনে নেয়ার বলে মনে করেননি।

তাই বলে তার নিজের মতকেই অভ্রান্ত ও কালোত্তীর্ণ বলে আঁকড়ে রেখেছিলেন তা-ও নয়। সময়ের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে তার চিন্তা-ভাবনাও নতুন বাঁক ধরে অগ্রসর হয়েছে। শেষাবধি যেখানে এসে তার আদর্শ পূর্ণতা পায় সেই আদর্শকেই চিরন্তন সত্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। নিজের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে যা ভাবতেন সামগ্রিকভাবে তার দর্শন-চিন্তা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা নিয়েও সে কথা সমানভাবে বলা চলে। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা ১৯৩৫ সালের এক চিঠিতে তিনি বলছেন, 'আমার সাহিত্যসৃষ্টি কার্য্যে আমি একটা আদর্শ উদ্ভাবিত করেছি। সেই ছাঁচে যা রচিত হয়েছে তা যদি না চিরকালের মতো মূল্যবানও হয় তবুও সাহিত্যিক মুসোলিনী বা লেনিন হয়ে আগামীকাল ও সর্বজনের জন্য সেই ছাঁচকে পাকা করে দিতে চাইলে সেটা সইবে না, যদি সয় তবে দুঃখের বিষয় হবে। অথচ নিজের আদর্শমতো বিচার করবার ঝোঁক আমার স্বভাবতই হবার কথা। এই আদর্শের প্রভাব ততদিন স্বাস্থ্যকর হতে পারে যতদিন যুগের পরিবর্তন না হয়। কনারকের মন্দির স্থাপত্যের চরমতা পেয়ে থাকবে, কিন্তু তার শিল্পী আজও যদি অমর হয়ে সেই মন্দিরেরই শাসনতন্ত্র প্রচার করতে থাকেন তাহলে বিদ্রোহ করা অপরাধ হবে না। তাঁর কাজ হয়ে গেছে, মানুষের আনন্দ সংবাদ দিয়ে গেছেন, কিন্তু অন্যকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বিশ্ববরেণ্যরা পাছে রাস্তা আগলে থাকেন এ আশঙ্কা মন থেকে যেতে চায় না।'

কালের যাত্রা ধ্বনি মেনে বদলে নিতে হবে চলার পথ, বারে বারে ফিরে যেতে হবে অভ্যস্তের বিপরীতে, অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই, কিন্তু এছাড়া তো অন্য কোন পথ আমাদের সামনে খোলা নেই। কিন্তু এ খুঁজে ফেরা কেবল নবায়নের জন্যে নবায়ন নয়, এরও 'গ্রামার' রয়েছে, প্রামাণ্যতার দাবি রয়েছে এই চর্চায়, অনুশীলনের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাইয়ের পরীক্ষা আছে এতে। এসব বিদ্যা-অর্জনের জন্যও রবীন্দ্রনাথের রচনাকর্মে ফিরতে ফিরতে হবে আমাদের। তার চিঠিপত্রের সান্নিধ্যেও যেতে হবে। 'এমনকি' নয়, বিশেষভাবেই তার চিঠিপত্রের কাছে যেতে হবে।

২. কেন চিঠিপত্র?

রবীন্দ্রনাথের রচনাসম্ভারে চিঠিপত্র ও প্রচলিত অর্থে যাকে সাহিত্যকর্ম বলি এ দুটি ধারা হাত ধরাধরি করে চলছে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল এই বৈশিষ্ট্যটি বিশ শতকের আর যারা একই সঙ্গে সাহিত্যকর্ম ও অবিশ্রান্তভাবে চিঠি লিখেছেন তাদের প্রায় সবার মধ্যেই দেখা যায়। সকালে দেখা হয়েছে তেমন লোককেও বিকেলে চিঠি লিখেছেন অনেকেই এবং অধিকাংশ সে সব চিঠিকে যত্নের সঙ্গে রক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল রচনার অনেক রচনায় তার চিঠিপত্রের প্রসঙ্গ অবশ্য মাঝে মাঝেই এসে পড়েছে। কিন্তু চিঠিপত্রকে যদি সাহিত্যকর্মের বিশেষ শাখা হিসেবে দেখে তাকে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে বসি, সেক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রবিষয়ক নানা ভাবনার সন্ধান আমরা পাব। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীনতম গ্রন্থাগারটি যেভাবে অগ্নিকাণ্ডে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল, সে রকম কোনো দুর্ঘটনায় যদি সাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথের অন্যসব রচনা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং অলৌকিকভাবে রয়ে যায় কেবল তার চিঠিপত্রসমূহ তাহলেও তাকে খুঁজে নিতে কষ্ট হবে না আমাদের। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ১০ দিন পরে, ১৯৪১ সালের ১৮ আগস্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক ['দি ম্যান বিহাইন্ড দ্য প্লাও' খ্যাত] এক স্মৃতিসভার ভাষণে বলেছিলেন, 'যদি কোনো নৈসর্গিক বিপর্যয়ে গত আশি বৎসরের ইতিহাসের নিদর্শন ও উপকরণ একেবারে লোপ পায়, তাহা হইলেও রবীন্দ্রসাহিত্য হইতে সে ইতিহাসের ধারা ও প্রকৃতি পুনর্গঠন করা বহু কষ্টসাধ্য হইবে না।' এ কথা বিশেষ করেই তার চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শৌরীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর কাজ [চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৪] থেকে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি লেখা হয়েছিল ১৮৮১ সালে প্রিয়নাথ সেনকে উদ্দেশ করে, আর শেষ চিঠি লেখা অমিয় চক্রবর্তীকে ১৯৪১ সালের ৮ জুন। অর্থাৎ বিশ বছর বয়স থেকে মৃত্যুর দু'মাস আগে পর্যন্ত তার পত্র রচনায় যতি পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রকে বিশেষভাবে আমল দেওয়ার কারণ এই চিঠিগুলোর চরিত্র। প্রথমত, কতগুলো চিঠি লেখাই হয়েছে, 'পত্র-প্রবন্ধ' রূপে এবং সেভাবেই ছাপা হয়েছে সেকালের বংগদর্শন, সাধনা, ভারতী, সবুজপত্র, প্রবাসী, মডার্ন রিভিয়্যু, পরিচয় প্রভৃতি সাময়িকপত্রে। পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে ছাপাবেন এরকম ভাবনা এসব চিঠি লেখার গোড়া থেকেই ছিল। এদের মধ্যে কতগুলো রচনা কবির জীবদ্দশাতেই গ্রন্থস্থ হয়েছে, যেমন য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী, ভানুসিংহের পত্রাবলী, পথে ও পথের প্রান্তে। কিন্তু যেসব পত্র অগ্রন্থিত ছিল তাদেরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তার জীবদ্দশাতেই দৈনিক পত্রে বা সাময়িকী পত্রে বিভিন্ন বিষয়ে তার মতাদর্শগত অবস্থান কি তা জানানোর জন্য মুদ্রিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধারায় আসে সেসব চিঠি যেগুলো সেভাবে জনসমক্ষে আসেনি তাঁর জীবদ্দশায়, কিন্তু সেসব পড়লেই বোঝা যায় তা আসলে কোন নির্মীয়মাণ প্রবন্ধের আদি-খসড়া, যাতে করে আইডিয়াগুলোকে ঝালিয়ে নেয়া যায়। অনেক সময় ঝালিয়ে নেওয়াও উদ্দেশ্য থাকে না, নিজের চিন্তাসমষ্টিকে প্রকাশ করার তাগিদই সেখানে মুখ্য। এ রকম চিঠির সংখ্যা প্রথম ধারার চিঠির চেয়ে অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথের রচনাকর্ম বিচারে এসব চিঠির মূল্য অপরিসীম। ১৯৩১ সালে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চিঠিতে তিনি তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এভাবে : 'বহুকালের স্বভাবদোষে নানারকমের চিন্তা অন্তরের ক্ষেত্রে চরে বেড়ায়। বেঁধে যদি তাদের চালাতে যাই তাহলেই বলগা দাঁতে কামড়িয়ে ধরে থেমে যাবার চেষ্টা করে। তখন জিন লাগাম ফেলে দিয়ে খালি পিঠে চড়ে পা দোলাতে দোলাতে মাঠে বাটে বনে বাদাড়ে দৌড় করিয়ে নিয়ে আসি–একেই বলে আমার চিঠি। এ হচ্ছে নিজের মনকে স্বচ্ছন্দে হাওয়া খাওয়ানো। একে চিঠি বলাই ভুল। যাকে লিখি সে লক্ষ্য নয়, সে উপলক্ষ্য মাত্র।' তবে স্বীকার করছেন তার পরপরই যে, উপলক্ষেরও দাম আছে, কেননা এ রকম চিঠি তো সবাইকে লেখা চলে না।

তৃতীয় ধারার চিঠিপত্রের মধ্যে পড়ে অতিব্যক্তিক রচনা যেখানে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন দৈনন্দিন লেনদেনের অসংখ্য খুচরো কেজো ও অকেজো প্রসঙ্গ ধরা পড়ে। ব্যক্তিমানুষকে জানার জন্য এরও প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু সেটা আমাদের আগ্রহের প্রধান কারণ নয় এখানে। অতিব্যক্তিক চিঠিতে কিছু কিছু লাইনে অবশ্য অপ্রত্যাশিতভাবে ঝিলিক দিয়ে ওঠে নানা সামাজিক, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ এবং যেমন আমরা কয়েকটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে একটু পরেই দেখব, অনেক ক্ষেত্রে অতিসাধারণ আলাপচারিতার পুকুরে অসাধারণ চৈতন্য-মাছের আকস্মিক আলোড়ন অনেক গদ্য-প্রবন্ধের চেয়ে কবির মনোভঙ্গি বুঝতে বেশি সহায়ক হয়।

৩. পার্টিশনের ছায়া

রবীন্দ্রনাথ প্রথম পার্টিশনের [১৯০৫-০৭] পক্ষে ও বিপক্ষে

ORION GROUP

আন্দোলন দেখে গিয়েছিলেন, দ্বিতীয় পার্টিশন [১৯৪৭] দেখার দুর্ভাগ্য তার হয়নি। প্রথম পার্টিশন-এর সময়ের স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে তার রচনাগুলো সুবিদিত। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ করার আন্দোলনের সাথে প্রথমদিকে তিনি জড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু খুব দ্রুতই তার মোহভঙ্গ ঘটে। ভারতবর্ষ ও আত্মশক্তি গ্রন্থের প্রবন্ধমালায় এ আন্দোলন নিয়ে তার প্রাথমিক উৎসাহ ও পরবর্তী হতাশার পরিচয় মেলে। এ নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। আমি এখানে শুধু চিঠিপত্রের বাড়তি সাক্ষ্য দিচ্ছি। সামাজিক শ্রেণী বিভেদ জিইয়ে রেখে উপর থেকে রাজনৈতিক মিলনের ডাক ও স্বদেশী স্বনির্ভরতার আহ্বান সফল হওয়ার নয়– এটা রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন পরই বুঝতে পারছিলেন। এটাই ছিল তার ক্ষোভের প্রধান কারণ। জমিদারে-কৃষকে, হিন্দুতে-মুসলিমে, ভদ্র সম্প্রদায়-লোকসাধারণে যে গভীর ফাটল দেখা দিয়েছিল অনেক দিন ধরেই তার মীমাংসার চেষ্টা না করে শুধু রাজনৈতিক স্বদেশী আন্দোলন যে আরও বড় ধরনের ফাটলের মুখে দেশকে ঠেলে দেবে এই আশঙ্কা তাঁর ছিল। তবে সব ক্ষোভ প্রবন্ধে প্রকাশ পায়নি, যতটা পেয়েছে চিঠিপত্রে। রামেন্দ্রসুন্দর

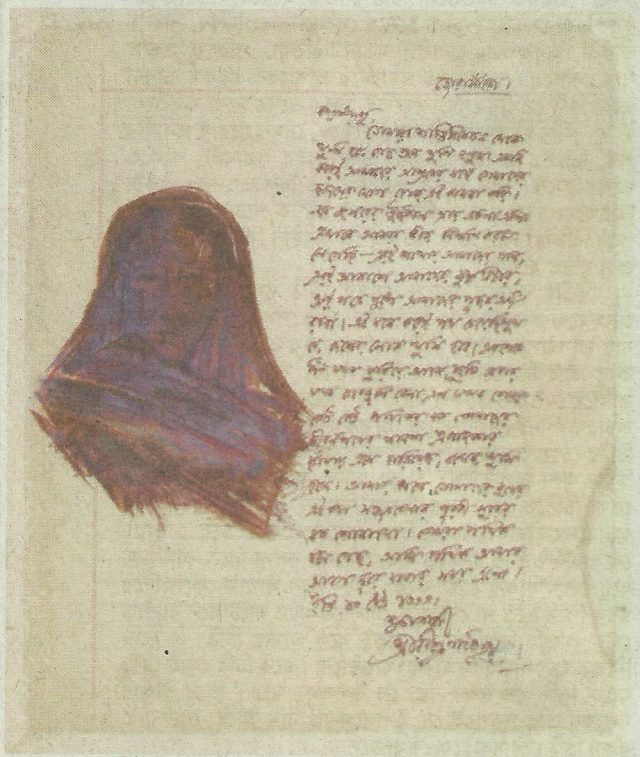

রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি

ত্রিবেদীকে ১৯০৫ সালের ১২ ডিসেম্বর ইতিমধ্যে বহু-উদ্ধৃত চিঠিতে তিনি এই ক্ষোভকে এভাবে প্রকাশ করেছেন এসব আন্দোলন থেকে নিজের বিযুক্তি ঘোষণা দিয়ে : "বৃথা চেষ্টায় নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। বিশেষত উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব। আমি কোনো জন্মেই 'লীডার' বা জনসংঘের চালক নহি– আমি ভাট মাত্র ... 'নেতা' হইবার দুরাশা আমার মনে নাই– যাঁহারা 'নেতা' বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি– ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।" তবে বিযুক্তির সংকল্প ঘোষণা সত্ত্বেও তারপরও তাকে বিভিন্ন সভায়-সমাবেশে যেতে হয়েছে এবং বেশকিছু সাংস্কৃতিক স্বদেশিয়ানার সাথে যুক্ত হতে হয়েছে যার সাথে তার মনের সায় ছিল না।

ত্রিবেদীকেই ১৯০৮ সালের আরেকটি চিঠিতে পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছেন : 'কনফারেন্সে আমাকে সভাপতির পদে আহ্বান করার সংবাদ পাইবামাত্র নানা পক্ষ হইতে গালি সংযুক্ত কত বিনামী পত্র পাইয়াছি যে, আমি যে কোন দলের লোক তাহা স্থির করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম কনফারেন্স মঞ্চে যখন মাথায় কেহ চৌকি ছুঁড়িয়া মারিবে তখন তাহাকে হাত জোড় করিয়া বলিব– বাবা, তুমি কোন পক্ষের লোক আমাকে বলিয়া যাও– তাহা হইলে আমি যে কোন দলে আছি সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ঘুচিয়া যায়।'

১৯১০ সালের অক্টোবরে ত্রিবেদীকে আবারও লিখলেন তাঁর মনের অবস্থা জানিয়ে : 'বর্তমান অবস্থায় আমাকে ভিড়ের হাত থেকে বাঁচান। আমি যেটুকু পারি কাজ করচি এবং করব। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে আমি আর মিশতে পারব না। গোলে হরিবোল দেওয়াই ভিড়ের প্রধান কাজ, এখন আমার সে রকম উদ্যম, ইচ্ছা এবং গলার জোর নেই।'

রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু বিবৃতি, গান, সভায়-সমিতিতে যোগদান হিন্দু [ব্রাহ্মসহ] ও মুসলিম উভয় সমাজেই তাকে মাঝে মাঝে বিতর্কের মুখে ফেলেছে। এর জন্যে রবীন্দ্রনাথ যতটা দায়ী, তারচে' দায়ী হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও ভদ্রলোক শ্রেণীর সংকীর্ণ মতাদর্শ, আত্মস্বার্থ চিন্তা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। এক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ দেব যা নিয়ে অতীতে প্রবল ধূলিঝড় উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে বন্দে মাতরম গানে সুরারোপ, শিবাজী উৎসবের জন্য গান লিখে দেওয়া, জনগণমন অধিনায়ক সম্পর্কিত বিতর্ক, 'কম্যুনাল এওয়ার্ড'-এর বিরুদ্ধে বিবৃতিতে সই প্রদান। আমি এখানে শুধু চিঠিপত্রের সাক্ষ্য তুলে ধরছি রবীন্দ্রনাথের ভিন্নমত বোঝার ক্ষেত্রে যা সহায়ক হবে।

জনগণমন অধিনায়ক গানটি নিয়ে প্রশ্ন তাকে অনেকেই করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রগতিশীল শিবিরে এ নিয়ে এক সময় ঝড় বয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্র গবেষক পুলিনবিহারী সেনকে ১৯৩৭ সালে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছেন যে, 'বুঝতে পারচি এই গানটি নিয়ে দেশের কোনো মহলে যে দুর্বাক্যের উদ্ভব হয়েছে তাঁরই প্রসঙ্গে প্রশ্নটি তোমার মনে জেগে উঠল। ফ্যাসিস্ট নীতিতে মতভেদ নিরাপদ নয়, কঠিন শাস্তি তার জন্যে নির্দিষ্ট, তেমনি আমাদের দেশে মতভেদকে চরিত্রদোষের শামিল করে পরুষভাষায় নিন্দা করা হয় আমার জীবনে বারবার তার পরিচয় পেয়েছি, কখনো তার প্রতিবাদ করিনি। তোমার চিঠির জবাব দিচ্চি কলহের উষ্মা বাড়াবার জন্যে নয়, ঐ গান সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল মেটানোর জন্যে। ... সে বৎসর ভারতসম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারের প্রতিষ্ঠাতা আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্য আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি। যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক। সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না। আজ মতভেদবশত আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ভাবটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয় কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশটা দুর্লক্ষণ।'

কিন্তু এই প্রসঙ্গে তার মনে এলো শিবাজী উৎসব উপলক্ষে গান রচনার কথা। শিবাজী প্রশস্তির এই গান রচনা করে অহিন্দুর মনে তিনি আঘাত দিয়েছেন এ কথা অনেকবার মুসলিম ভদ্র সম্প্রদায়ের রচনায় উচ্চারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বয়ানেই তার আত্মপক্ষ সমর্থন শোনা যাক : 'এক দিন আমার বন্ধু হেমচন্দ্র

ORION GROUP

মল্লিক বিপিন পাল মহাশয়কে সঙ্গে করে একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের কথা ছিল, এই বিশেষভাবে দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিলিয়ে দিয়ে তারা শারদীয় পূজার অনুষ্ঠানকে নতুনভাবে দেশে প্রবর্তিত করতে চান, তার উপযুক্ত ভক্তি ও উদ্দীপনামিশ্রিত স্তবের গান রচনা করবার জন্যে আমার প্রতি তাঁদের ছিল বিশেষ অনুরোধ। আমি অঙ্গীকার করে বলেছিলুম এ ভক্তি আমার আন্তরিক হতে পারে না; সুতরাং এতে আমার অপরাধের কারণ ঘটবে। ... আমার বন্ধুরা সন্তুষ্ট হননি। আমি রচনা করেছিলুম ভুবন মনোমোহিনী, এ গান পূজামণ্ডপের যোগ্য নয় সে কথা বলা বাহুল্য। অপরপক্ষে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এ গান সর্ব্বজনীন ভারতরাষ্ট্র সভায় গাবার উপযুক্ত নয়, কেননা এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দু সংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিতভাবে মর্মঙ্গম হবে না।'

বন্দে মাতরম প্রসঙ্গেও তার নিজস্ব ব্যাখ্যা আমাদের মনোযোগ দাবি করে। বন্দে মাতরম বঙ্কিমের রচনা, ১৮৯০-এর দশকে বঙ্কিমের জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্রনাথ এর প্রথম স্তবকে সুরারোপ করেন। ১৯৩৭ সালে এই গানটির সার্বজনীন আবেদন নিয়ে নতুন করে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়। মুসলমান সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গানটিকে এক সময় 'ইসলামবিরোধী' বলে মনে করতে শুরু করেন। যার ফলে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গানটি গৃহীত হতে পারে কি না, এ বিষয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনা শুরু হয়। সেই আলোচনার আগে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ নেওয়া হয় এবং কংগ্রেস ঠিক করে যে, গানটির প্রথম স্তবক সভা-সম্মেলনে গাওয়া যেতে পারে। তবে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে অন্য গান গ্রহণ করা হবে। আনন্দবাজার পত্রিকা 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের সমাধি রচনায় কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তকে 'অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত' বলে অভিহিত করে। এবং বাঙালি হিন্দু সমাজের এক বড় অংশ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকেন। ১৯৩৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর বুদ্ধদেব বসুকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেন এভাবে : 'বন্দে মাতরম ব্যাপারটা নিয়ে বাঙালি হিন্দু সমাজে যে উন্মত্ত বিক্ষোভের আলোড়ন উঠেছে আমার বুদ্ধিতে এ আমি কখনো কল্পনাও করি নি। ... গালিগালাজ জিনিসটা চিরপ্রত্যাশিত– বাংলাদেশে যখন জন্মেছি তখন কটূক্তির হিল্লোল উঠলেই অনুভব করি স্বদেশী হাওয়া সেবন করছি। এ নিয়ে কোনোদিন নালিশ করিনি প্রতিবাদ করিনি। আমার দুঃখিত হবার দিন গেছে, কিন্তু বিস্মিত হবার বোধশক্তি এখনো ভোঁতা হয়ে যায়নি।'

একই চিঠির অন্যত্র তিনি বলছেন : 'তর্কটা হচ্ছে এ নিয়ে যে, ভারতবর্ষে ন্যাশনাল গান এমন কোনো গান হওয়া উচিত যাতে একা হিন্দু নয় কিন্তু মুসলমান খ্রিস্টান– এমনকি ব্রাহ্মও– শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে যোগ দিতে পারে। তুমি কি বলতে চাও 'ত্বং হি দুর্গা', 'কমলা কমলদল বিহারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িনী' ইত্যাদি হিন্দু দেবী নামধারিণীদের স্তব, যাদের 'প্রতিমা ভূজি [গাড়ি] মন্দিরে মন্দিরে', সার্বজাগতিক গানে মুসলমানদের গলাধঃকরণ করাতেই হবে। হিন্দুর পক্ষে ওকালতি হচ্ছে এগুলি আইডিয়া মাত্র। কিন্তু যাদের ধর্মে প্রতিমা পূজা নিষিদ্ধ তাদের কাছে আইডিয়ার দোহাই দেবার কোনো অর্থই নেই। ... কালীঘাটে পাঁঠা-বলির পক্ষে স্বকর্ণে এমন যুক্তি শুনেছি– প্রত্যক্ষে ও জন্তুটা একটা পাঁঠা, কিন্তু ভাবের দিকে পাশব রিপুর মূর্তি। তা হোতে পারে কিন্তু বুধগয়ার মধ্যে ভক্ত হিন্দু পাঁঠা-বলি উপলক্ষে সর্বমানবের পাপের বলিদান যখন কল্পনা করে তখন কি বৌদ্ধ উপাসকেরাও পাঁঠা উৎসর্গ করে সর্বজনীন দুর্গাপূজার বারোয়ারিতে যোগ দিতে পারবে– আর না পারলেই ভক্তের দল ক্ষোভে ধিক্কারে বুক চাপড়িয়ে মরবে।'

৪. 'দূর হোক গে তোমার ইতিহাস'

জাতীয়তাবাদের সাথে ইতিহাসবিদ্যার একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় ইতিহাসবিদ্যার আধিপত্য বিষয়ে একটি প্রবল উদ্বেগের চিহ্ন পাই– যা জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা বনাম 'নিচে থেকে দেখা' ইতিহাসচর্চা এ ধরনের সমালোচনা পাল্টা সমালোচনার বাইরে। রণজিৎ গুহের 'হিস্ট্রি এট দ্য লিমিট অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি' বইয়ে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তার এই দিকটা নিয়ে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। আমরা এখানে চিঠিপত্রের আলোকে বিষয়টিকে পুনরায় দেখতে চাই।

বন্দে মাতরম গানটি নিয়ে যখন শোরগোল উঠল তখন এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে ১৯৩৮-৪১ সালে বেশকিছু পত্র বিনিময় হয়েছিল। তারই এক ফাঁকে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাসের তত্ত্ব বোঝাতে বসলেন– অর্থনীতি-নির্ভর ইতিহাস ব্যাখ্যার দোহাই পেড়ে। বুদ্ধদেব নিজেকে পরবর্তীকালে বা এর আগে কখনো মার্কসের অনুসারীদের মধ্যে নিজেকে দেখেননি, কিন্তু এবারে যুক্তির খাতিরে মার্কসের দ্বারস্থ হলেন, যদিও সরাসরি উল্লেখ করলেন না। বুদ্ধদেবের মত ছিল যে, বন্দে মাতরমের সমস্ত গানটা গ্রহণীয় নয় এবং কংগ্রেস গানের যতটা ছেঁটেছেন, তার অনেক বেশি ছেঁটে ফেললেও কোন

তারুণ্যে

ক্ষতি নেই, কেননা সমস্ত গানের মধ্যে 'বন্দে মাতরম' বাক্যটিই শুধু মূল্যবান। মূল্যবান আর কোনো কারণে নয়, ভারতের গত পঞ্চাশ বছরের জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত হয়ে এসেছে বলে। ... কথার মূল্য শুধু সেখানেই, যেখানে আমরা একটি পঙ্‌ক্তিকে স্লোগান বা War-cry হিসেবে ব্যবহার করি। এবারে বুদ্ধদেবের যুক্তিবিস্তারটি শুনি :

'[আগে] বিস্তৃতভাবে বলতে পারিনি, এখানে বলি। আসল ব্যাপারটা অন্য রকম। ইংরেজ ভারতে 'ইতিহাসের হাতিয়ার' বৈ কিছু নয়। ভারতের বাদশাহী ফিউডালিজমকে ধ্বংস করে ইংরেজ আনলে নতুন যুগ, আনলে ক্যাপিটালিজম। ভারতে যা ছিল না, সেই বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি করলে তারা। ... পেলুম আমরা ভাগ, নেটিভ বুর্জোয়ার প্রতিষ্ঠা হলো, এবং সেই বুর্জোয়া শ্রেণী

ORION GROUP

সম্পূর্ণই হিন্দু ... বন্দে মাতরম হলো এই লিবারেল বুর্জোয়া হিন্দুর সঙ্গীত এবং যেহেতু আমাদের জাতীয় আন্দোলন এখনো মোটামুটি এই বুর্জোয়ার যুদ্ধ ছাড়া কিছু নয়, সেই কারণেই এখনো বন্দে মাতরম-এর কিঞ্চিৎ প্রাণশক্তি রয়েছে। ভারতীয় ধনতন্ত্র বিদেশি ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে উদ্যত– এই তো আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল কথা। কিন্তু দেশের বেশির ভাগ লোকের পক্ষে এ আন্দোলনের কোনো অর্থ নেই। ... তাদের মধ্যে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, কিন্তু তারা তাদের হিন্দুত্ব কি মুসলমানত্বের জন্য মোটেও চিন্তিত নয়, পেট ভরে খেতে পাওয়ার চেয়ে বড়ো জিনিস কিছু নয় তাদের পক্ষে। এবং বন্দে মাতরং 'মন্ত্র'ও তাদের নয়; এটা দেখাই যাচ্ছে যে ভারতের শ্রমিকরা কখনো বন্দে মাতরং উচ্চারণ করে না। আপনার কি মনে হয় না আমাদের জাতীয় আন্দোলনের চেহারা একদিন বদলে যাবে; যখন যুদ্ধটা হবে ইংরেজ আর ভারতীয়ের মধ্যে নয়, যে ধনতন্ত্রের ইংরেজ ও ভারতীয় উভয়েই অংশীদার তার সঙ্গে দেশব্যাপী বিরাট শ্রমিক শ্রেণীর। তখন বন্দে মাতরং-এর কোনো মূল্যই থাকবে না। তখন সেই আন্দোলনই সৃষ্টি করবে নতুন সঙ্গীত, নতুন স্লোগান।'

এ রকম একটি আপাতদৃষ্টিতে মার্কসবাদী বিবেচনার বিপরীতে বিরুদ্ধ কোনো প্রবল যুক্তি দেয়ার অবকাশ কম বলে মনে হতে পারে। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানালেন, তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন জেনে যে বুদ্ধদেব আর সবার মতো বন্দে মাতরং-এর প্রভাবে পড়েননি। কিন্তু এটাই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র প্রতিক্রিয়া ছিল না। এর বছর তিনেক বাদে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অভাবিত একটি যুক্তি দিলেন। যা আজকের দিনে অনেকের কাছে অসঙ্গত মনে না হতে পারে; কিন্তু সে যুগের চলতি হাওয়ার প্রেক্ষিতে ছিল অনেকটাই অপ্রত্যাশিত। মৃত্যুর প্রায় আড়াই মাস আগে লেখা [২৪ মে ১৯৪১] চিঠিতে বুদ্ধদেবকে জানাচ্ছেন, [ইতিহাস নিয়ে] 'কোনো এক জায়গায় আমার বিরক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে। আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত একথা বারবার শুনেছি এবং বারবার ভিতরে ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে যেখানে আমি আর কিছু নই কেবলমাত্র কবি সেখানে আমি, সৃষ্টিকর্তা সেখানেও আমি একক, আমি মুক্ত। বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পণ্ডিত আমার সেই কাব্যস্রষ্টার কেন্দ্র থেকে টেনে এনে ফেলে যখন আমার সেটা অসহ্য হয়।' তিনটি উদাহরণ দিলেন ইতিহাসের নিয়ম অস্বীকার করার। এখানেই ছেলেবেলার একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন– 'একদিন স্কুল থেকে এসে আমাদের পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিলুম। ধোপার বাড়ি থেকে গাধা এসে চরে খাচ্ছে ঘাস। এই গাধাগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতির বানানো গাধা নয়– এ আমাদের চিরকালের গাধা, এর ব্যবহারে কোনো ব্যতিক্রম হয়নি আদিকাল থেকে। আর একটি গাভী সস্নেহে তার গা চেটে দিচ্ছে। ... একথা আমি নিশ্চিত জানি, সেদিনকার সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্য মুগ্ধ চোখে দেখেছিল। ... ইতিহাস যেখানে সাধারণ, সেখানে বৃটিশ সাবজেক্ট ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সেখানে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের বিচিত্র লীলা চলছিল কিন্তু নারকেল গাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল সেটা বৃটিশ গভর্নমেন্টের রাষ্ট্রিক আমদানি নয়।' এরপর দ্বিতীয় উদাহরণ দিলেন তার নিজের সৃষ্ট 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলির। তার ভাষায় :

'এক সময় আমি যখন বৌদ্ধকাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। ... এক সন্ন্যাসী বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায়, এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল। এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হতো তাহলে সমস্ত দেশ জুড়ে কথা ও কাহিনীর হরিলুট পড়ে যেতো।'

এরপর এলো পূর্ববঙ্গের জীবননির্ভর তার গল্পগুচ্ছের উদাহরণ। এখানে তার নিজস্ব তত্ত্বের কথা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল :

'আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখ-দুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল, তার পূর্বে আর কেউ করেনি।... সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখ-দুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লী-পার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ নিয়ে। কখনোবা মোগল রাজত্বে, কখনোবা ইংরেজ রাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে। সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয়, কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়। এখনকার সমালোচকেরা যে বিস্তীর্ণ ইতিহাসের মধ্যে অবাধে সঞ্চরণ করেন তার মধ্যে অন্তত বারো আনা পরিমাণে আমি জানিই নে। বোধ করি সেইজন্যই আমার বিশেষ করে রাগ হয়। আমার মন বলে দূর হোকগে তোমার ইতিহাস। ... তাই তোমাদের ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে আমিও কোমর বেঁধে লাগব বাড়াবাড়ি করতে।'

এবার কিছুটা সশঙ্ক চিত্তে রবীন্দ্রনাথের এসব কথার ভেতর দিয়ে যে তত্ত্বগত অবস্থান বেরিয়ে এসেছে সে সম্পর্কে আমার বুঝটা বলি। প্রথমত, বঙ্কিমের মতো 'ইতিহাস লেখার' আহ্বান জানাচ্ছেন না তিনি, কেননা এদেশের ইতিহাস নেই তার রাষ্ট্রজীবনের ঘটনাযুদ্ধে। সেই অন্য ইতিহাসের চিহ্ন আছে তার সাংস্কৃতিক উদাহরণগুলোয় লোকধর্মের চর্চায়, লোকপ্রবাদে, গানে ও কাহিনীমালায়। দ্বিতীয়ত, প্রথাগত ইতিহাসে মানবজীবনের ['সরল মানবত্বের'] স্থান নেই। যে ইতিহাস তিনি চান সেটি গড়ে উঠবে 'প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ' নিয়ে। ক্ষমতা চর্চার বাহন হিসেবে যে ইতিহাস বিদ্যা গড়ে উঠেছে তাতে করে রাষ্ট্র আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে– মানবজীবনের প্রাত্যহিকতার আলাপ গিয়েছে চাপা পড়ে। এটি ঠিক 'তল থেকে দেখা' বা 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' নয় কেবল। এটা ইতিহাস বিদ্যাকে অন্য আরেকটি মৌলিকভাবে ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত করা। এবং এদিকটিই ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তৃতীয়ত, আমরা রাষ্ট্রিক ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থাকি বটে। কিন্তু সেটা আমাদের বড় পরিচয় নয়। আমরা নিজেরাই একেকজন সৃষ্টিকর্তা হয়ে নতুন সমাজ, জীবন ও সংস্কৃতির নির্মাণ করি, করতে পারি, এই রাষ্ট্রিক জালের মধ্যে থেকেই এই স্বাধীনতা মৌলিকভাবে রয়ে গেছে আমাদের সকলের মধ্যে। ফলে জাতীয় প্রয়োজনে, রাজনৈতিক তাগিদে আর যা যা সব ব্যবহারিক কারণে ইতিহাস চর্চার যে ছলই আমরা আশ্রয় করি না কেন– সেটাই একমাত্র ও পরম সত্য নয়। আমাদের দেশের বর্তমান বাস্তবতায় যেখানে দল-বিভাজিত ইতিহাস চর্চা আমাদের জনজীবনকে মোহমুক্তভাবে চোখে দেখতে দেয় না সেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসাই আমাদের কর্তব্য। এবং এই মতের সপক্ষে প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ 'কোমর বেঁধে' লড়াই করতেও প্রস্তুত।

৫. প্রথাগত ধর্ম-পরিচয়ের বাইরে

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে ধর্ম সম্পর্কে। বিশেষত তার নিজের ধর্ম-ভাবনা নিয়ে নানা পর্যায়ের চিন্তার সংকলন। একমাত্র হেমন্তবালা দেবীকেই তিনি এ নিয়ে ২৬৪টি চিঠি লিখেছেন যা বিশদ সমীক্ষার দাবি রাখে। এখানে সংক্ষেপে তার আত্মপরিচয়ের কয়েকটি দিক তুলে ধরছি।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন, নাকি ব্রাহ্ম ছিলেন অথবা ছিলেন অন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসের আবর্তে– প্রথমেই সে প্রসঙ্গে আসি। ২৭ জুন ১৯৩১ সালে হেমন্তবালাকে লিখছেন :

'আমার কথা ব্রাহ্মসমাজের কথা নয়, কোনো সম্প্রদায়ের কথা নয়, য়ুরোপ থেকে ধার করা বুলি নয়। য়ুরোপকে আমার কথা শোনাই, বোঝে না, নিজের দেশ আরো কম বোঝে।

ORION GROUP

অতএব আমাকে কোনো সম্প্রদায়ে বা কোনো দেশখণ্ডে বদ্ধ করে দেখো না। আমি যাকে পাবার প্রয়াস করি সেই মনের মানুষ, সকল দেশের সকল মানুষের মনের মানুষ, তিনি স্বদেশ-স্বজাতির উপরে। আমার এই অপরাধে যদি আমি স্বদেশের লোকের অস্পৃশ্য, সনাতনীদের চক্ষুশূল হই, তবে সেই আঘাত আমাকে স্বীকার করে নিতেই হবে।'

অন্যত্র ['ব্রাত্যজনের তত্ত্বচিন্তা', সমকাল ২০১১] আমি বলার চেষ্টা করেছি যে, রবীন্দ্রনাথ লালনের গান থেকে মনের মানুষের ধারণাটি গ্রহণ করেছিলেন এবং এই তত্ত্বটি তিনি নানা পর্যায়ে নানা রচনায় তার ['রিলিজিওন অব ম্যান' ১৯৩১ সালের হিবার্ট বক্তৃতাসহ] গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত, এর মানে এই নয় যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে তার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু সেসব প্রধান প্রধান ধর্মমতকে তিনি ততটাই মূল্য দিয়েছেন যতটা তা 'মনের মানুষ'-এর অবস্থানকে শক্তিশালী করে। এই সূত্রেই তিনি মধ্যযুগের সন্ত কবীর, দাদূ, মীরাবাই, রামদাস প্রমুখের রচনার গতি আকর্ষিত হন এবং ক্ষিতিমোহন সেনের সাহায্যে কবীরের ১০০টি গানের অনুবাদ প্রকাশ করেন ইংরেজিতে। লালনের গানের সংকলন এবং এরকম আর যারা ছিলেন তাদের গানের সংকলনের প্রতি তার আগ্রহ ও উৎসাহের কথা জানিয়েছিলেন 'হারামনি'র মনসুরউদ্দিনকে যার একটি সাম্প্রতিক বিবরণী পাই ভূইঞা ইকবালের 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ' গ্রন্থে। পারস্যে গিয়ে নিজের পরিচয়ও দিয়েছিলেন হাফিজ ভক্ত প্রাচ্যদেশের আর এক সুফী কবি হিসেবে। তৃতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-দর্শনের প্রতি আগ্রহ থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক লোকাচারের পক্ষে তার সায় ছিল না একেবারেই। এক্ষেত্রে সনাতনী হিন্দু সমাজের আচার-নিষ্ঠতা, শুচিবাইলাই সম্পর্কে তার চিন্তায় কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। একগুচ্ছ উদাহরণ নিচে তুলে ধরছি।

ক. হেমন্তবালা তাকে লিখেছিলেন কবি যাতে নিম্নবর্গের মানুষকে ধর্মকথা শোনান। উত্তরে কবি লিখলেন :

'যাদের তোমরা অন্ত্যজ বলো তাদের নির্ম্মল ও শুচি হবার উপদেশ দিতে আমাকে অনুরোধ করেছ। করতে পারি যদি তুমি নিশ্চিত করে বলতে পার যে অন্য জাতীয় যারা ঠাকুরের দর্শন-স্পর্শন ও সেবার অধিকারী তারা সকলেই নির্মল নিরাময়, তারা অন্ত্যজগমন করে না, তাদের কারো দুষ্ট ব্যাধি নেই। অন্তরে-বাহিরে তারা সকলেই বা অধিকাংশই শুচি– তারা মিথ্যা মোকদ্দমা করে না, তারা অকপট। তারা মন্দিরে প্রবেশ করলে দেবতা যদি অশুচি না হন, শত শত বৎসর তাদের সংস্রবেও যদি তাদের দেবত্বে কোনো সংকোচ না ঘটে থাকে, তবে কেবল জন্মগত হীনতাই কি তাদের অসহ্য। দেবতা কি কেবল তোমাদেরই দেবতা, তোমাদের বিষয়সম্পত্তির মতো। দেবতা সম্বন্ধে এমন ধারণার মতো দেবতার অপমান আর কিছুই হতে পারে না– ভারতবর্ষে দেবতা অপমানিত এবং মানুষ অপমানিত।'

খ. দেবতার নাম করে মানুষের ওপরে নানা স্থূল আচার-আনুষ্ঠানিকতার জবরদস্তি নিয়ে লিখছেন :

'দেবতার নামে মানুষ নিজেকে বঞ্চিত করে শেলে শূলে বেঁধে। উপবাসে ক্লিষ্ট করে অকারণ বাধায় জীবনের পথ সংকীর্ণ করে... যে দেবতা বুদ্ধির দোহাই মানেন না দয়ার দোহাইও না তাকে যে মানুষ ভয়ে ভয়ে মানে সে নিজেকে অমানুষ করে। সে দেবতা নেই, মানুষই নিজের প্রবৃত্তিকে মুখোশ পরিয়ে দেবতা তৈরি করেচে, তার পরে মানুষই মরে তার হাতে।'

গ. অতিরিক্ত ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার চর্চায় দেশ ছেয়ে গেছে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'মানবসংসারের সমস্ত দায়িত্বকে বাইরে ঠেকিয়ে রেখে বুদ্ধিবৃত্তিকে অন্ধ করে নিরন্তর ভাবরস সম্ভোগে আত্মবিস্তৃত হওয়ার মধ্যে যতই সুখ বা শান্তি থাক, তাকে আমি কোনোমতেই শ্রেয় বলে মনে করতে পারি নে। এই ধর্ম বিলাসিতায় আমাদের দেশকে মর্ম্মে মর্ম্মে মেরেছে। সম্প্রতি নবজাগ্রত পারস্য ও আরব্যকে দেখে এসেছি, পূর্বে দেখেছি জাপানকে, তারা ধর্ম্মমোহ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই রাষ্ট্রীয় মুক্তি পাবার অধিকারী হয়েছে– হতভাগ্য ভারতবর্ষ এই মোহের কুহেলিকায় আবৃত– সে অন্ধ, সে পঙ্গু। সে আপনার দেবতাকে নিয়ে খেলা করচে সেই অপরাধে দেবতা তাকে সকল প্রকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করচেন, অপমানের আর অন্ত নেই।'

ঘ. ছোঁওয়া-খাওয়া নিয়ে শুচিবাই সম্পর্কে লিখেছেন :

'তোমার পরমার্থ ছোঁওয়া খাওয়া নিয়ে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের জাতবিচার নিয়ে। ... কালের গায়ে তো জাতের ছোঁয়াচ লাগে না। ... পৃথিবীতে [ভারতবর্ষ ছাড়াও] আরো অনেক দেশ আছে। যে দেবতাকে আমরা ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণদের আঁচলধরা করে শুচি করে রেখেছি। আশা করি সেই সব দেশও এই দেবতারই সৃষ্টি। সেসব দেশেও এমন সকল ভক্ত ও সাধকদের জন্ম হয়েছে স্মৃতি রত্নরা যাদের পায়ের ধুলো নেবারও যোগ্য নন।

ধর্ম-সংস্কার নিয়ে এক সময় একাধিক পরিকল্পনা তাঁর মনে স্থান পেয়েছিল। বস্তুত ধর্মকে কোনো একটা আবরণের মধ্যে বদ্ধ না রেখে তাকে ক্রমাগতই সমাজের অভিব্যক্তি বদলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'পরিণতির পথে চলতে হবে'– এমন একটা অবস্থান রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-চিন্তায় আগাগোড়াই ছিল। এ কথা তিনি ব্রাহ্মসমাজ নিয়েও ভাবতেন এবং ব্রাহ্মসমাজ এই পরিণতির অভাবে যে এক জায়গায় এসে আটকে গেছে, এ কথা তিনি নানা-ভাবেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে [মীরা দেবীর স্বামী] ১৯১৩ সালের একটি চিঠিতে লিখছেন : 'ব্রাহ্মসমাজ কোনো একটি আবরণের মধ্যে বদ্ধ হয়ে দৃঢ় হয়ে গেছে এ কথা যেন মনে না করি। তাকে ক্রমাগতই পরিণতির পথে চলতে হবে। আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের জীবনগত যোগ থাকা চাই। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে বিলিতি য়ুনিটোরিয়ান চার্চের প্রভাব ছিল সেটা যেমন ঠিক, তেমনি উপনিষদের আদর্শেও এই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়েছিল সেটাও ততখানিই সত্য। দেশি ও বিদেশি এই দুই ঘরানার মধ্যে যুদ্ধ চলছিল ব্রাহ্মসমাজের ভেতরেও; এবং এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একসময় একটি মধ্যপন্থার আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়।' তাই এক জায়গায় নগেন্দ্রনাথকে লিখছেন : 'বিলিতি য়ুনিটোরিয়ান চার্চ থেকে একটা দেশলাই কাঠি ধার করে এনে সেইটে ঘষাঘষি করলেই যে বিশ্বজনীনতা হয় এ কথা কিছুতেই মানা যেতে পারে না। এ কাঠি চিরদিন জ্বলবে না। এর পেছনে তেল নেই বাতি নেই– এ কথা আলো খোরাক পাবে কোথা থেকে। ব্রাহ্মসমাজকে একদিন এ কথা বুঝতেই হবে। এখনি বোঝাবার সময় হয়েছে।' ব্রাহ্মসমাজের র‍্যাশনালিজম যদি দেশের কাজে না লাগে তাহলে তার পরিণতি হবে এলিট-ধর্মের সংকীর্ণ সামাজিক বৃত্তে আটকে পড়ার মধ্যে। আর এর সুযোগ নেবে প্রাচীনপন্থী সনাতনী আদর্শে বেড়ে ওঠা সংস্কারবিমুখ হিন্দু সমাজ। তাই ঐ একই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ করার জন্যে। 'সমস্ত দেশের আমাদের নাড়ির যোগ স্বীকার করে স্বদেশের মধ্যে আমাদের স্থান গ্রহণ করতে হবে।' কারণটাও খোলাসা করে বলেছেন : 'আমরা অবজ্ঞাপূর্ব্বক আমাদের সেই স্থান ছেড়ে দিয়ে খৃষ্টানের পোষ্য পুত্র হতে গিয়েছিলুম বলেই আজ বিবেকানন্দের দল ব্রাহ্মসমাজকে এক পাশে সরিয়ে ফেলে দিয়ে দেশের হৃদয়ে সমস্ত জায়গা সম্পূর্ণজুড়ে বসবার উপক্রম করছে আর আমরা কেবল আমেরিকার মিড্ভিল্ এবং ইংলন্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজের ভেলা বুকে জড়িয়ে ধরে ভবসমুদ্র পার হব বলে স্থির করেছি।... অতএব এখনকার কালে আমাদের একমাত্র কাজ হবে স্বদেশের হৃদয়ের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজকে প্রতিষ্ঠা করে তার লক্ষ্মীছাড়া বাপ-মা-মরা ভিক্ষুক দশা গুচিয়ে দেওয়া।' এজন্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের দৈনিক উৎসের ওপর জোর দিয়েছেন : 'ব্রাহ্মসমাজ New নয়– ব্রাহ্মসমাজ আমাদের জাতির চিরন্তন– ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ভারতবর্ষের হৃদপদ্মের গূঢ় কোষের মধ্যে চিরকাল বাস করে এসেছে বলেই আজকের দিনে এই দেশেই তার আবির্ভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি। রামমোহন রায় নতুন কিছুই সৃষ্টি করেননি– তিনি

ORION GROUP

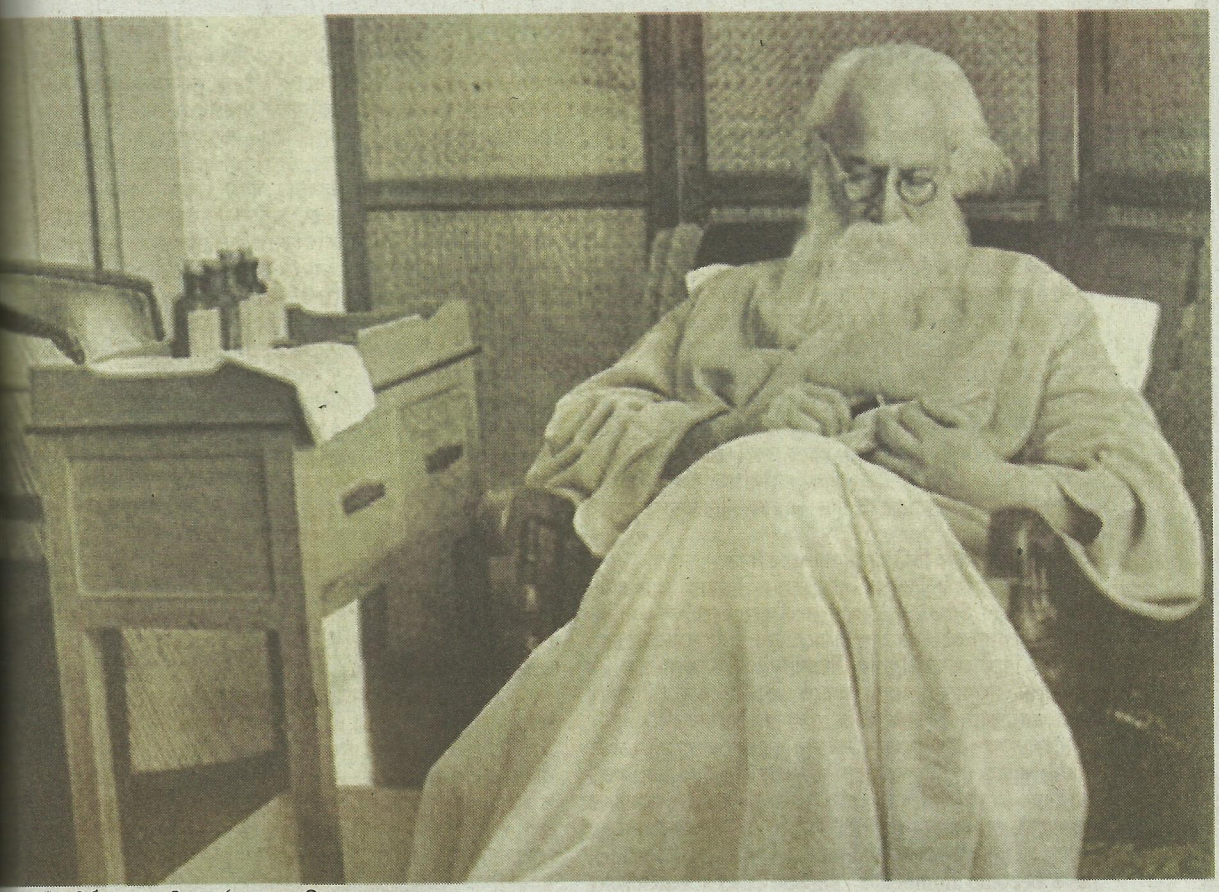

তাঁর চিঠিপত্র ও সাহিত্যকর্ম হাত ধরাধরি করে চলেছে...

আবরণ সরিয়ে দিয়ে আমাদের পুরাতন জিনিসকে আমাদের কাছে নূতন করে প্রকাশ করে দিয়েছেন।'

ব্রাহ্মসমাজকে দেশের মর্মমূলে স্থাপন করে একে নবায়ন করার যে-চিন্তা ১৯১৩ সালের রচনায় দেখতে পাই, সেটি অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। অচিরেই রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন যে 'আদি ব্রাহ্মসমাজকে' নবায়ন করার প্রকল্প সফল হবার নয়। এর পরের দিকের রচনায় তিনি যে ক্রমশ প্রতিষ্ঠানিক ধর্মমতের থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেলেন এবং আঁকড়ে ধরলেন কবীর-লালনের নিম্নবর্গীয় ভাবনাকে– সেটি স্পষ্টত হলো তাঁর 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' বক্তৃতামালায় এসে। এখানে তার 'জীবন দেবতা' বদলে গেল– হয়ে দাঁড়াল লালনের 'মনের মানুষ'– যে মানুষ দেশ-কালের ঊর্ধ্বে কোনো বিশেষ ধর্ম পরিচয়ের বাইরে তখনও তিনি, আমৃত্যু তিনি, ছিলেন আস্তিকতারই মানুষ; কিন্তু সেখানে তিনি হিন্দু-ব্রাহ্ম, খ্রিষ্টান বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের আশ্রয় নিতে চাইছেন না, বরং নির্মাণ করছেন তার একান্ত নিজস্ব ধর্ম-পরিচয়ের আদল। তার মনের মানুষ সব মানুষের মনের মানুষ, কেননা মানুষ মাত্রই মহৎ, কিন্তু মহৎ হওয়ার পরীক্ষায় তাকে এবং সবাইকে আজো পাস হতে হবে।

১৯০৪ সালে 'বঙ্গভাষার লেখক' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে, তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়– একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়।... শাস্ত্র যা লেখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে; কিন্তু সে-সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়।' সে সময়ে তার বিশ্বাস কোন দিকে গড়াচ্ছিল তার পূর্ণ পরিচয় তখন মেলে নি। সেই পরিচয় মিলল এসে ১৯৩৩ সালে 'মানুষের ধর্ম' রচনায়, যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে ১৯৩০ সালের হিবার্ট বক্তৃতামালার। সেখানে যা তিনি বলেছেন তাকে কোনো প্রচলিত ধর্ম, ধর্মাচার বা ধর্মমতের ভেতরে ফেলা চলে না। তিনি নিজে একে বলেছেন, সমগ্র জীবনব্যাপী তার ধর্মভাবনার সারাৎ-সার হিসেবে– মানুষের ধর্ম তার জন্যে ছিল এক নতুন 'ধর্মীয় অভিজ্ঞতা' [রিলিজিয়াস এক্সপিরিয়েন্স]। এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল টলস্টয়ের, এটি হয়েছিল রোম্যাঁ রোলাঁর মধ্যেও– যদিও এদের কারও অভিজ্ঞতাই রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় ভাবনার সমীপবর্তী নয়। রবীন্দ্রনাথের বয়ানেই সেই 'অভিজ্ঞতার' সারসংক্ষেপ শোনা যাক :

'মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ; জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই– অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাইরে-বিক্ষিপ্ত আপন-হারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারির মুখে–

'আমি কোথায় পাব তারে

ORION GROUP

আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে'।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেম–
'তোরই ভিতর অতল সাগর'।

সেই পাগলই গেয়েছিল–
'মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ'।

উপনিষদ দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার বৈদান্তিক পিতার সাহার্যে ও অনুপ্রেরণায়। শেষটায় কিন্তু তাকে ফিরে আসতে হলো লালনেই– তার একান্ত নিজস্ব মনের মানুষের অন্বেষণে। প্রচলিত ধর্মমতের বদ্ধ [closed] 'সিস্টেমে' নয়, মনের মানুষের ধর্মের মুক্ত [open] রাস্তায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুও নন, ব্রাহ্মও নন, নন তিনি আদি বা নব কোনো ব্রাহ্মসমাজের লোক। এর কোনোটিই তার ধর্মপরিচয় নয়। হেমন্তবালাকে তাই লিখতে পেরেছিলেন, 'ধর্ম্মমত আমার আছে কিন্তু কোনো সম্প্রদায় আমার নেই।' সেখানে তিনি একা। প্রথাগত ধর্ম পরিচয়ের বাইরে– অন্য কেউ। তাঁর সেই গান– এই পৃথিবীর অন্য ভুবনের।

৬. আঁমেরিকার চিঠি বনাম রাশিয়ার চিঠি

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন পাঁচবার, রাশিয়ায়– মাত্র একবার। তাতেই যা দেখার দেখা হয়ে গিয়েছিল। মার্কিন ধনতন্ত্রের যেমন করেছেন তীক্ষ্ণ সমালোচনা, রুশী সমাজতন্ত্রেরও তেমনই নির্মোহভাবে বিচার-বিশ্লেষণ। তাকে বাম-ডান যে বিশেষণেই দলবাজরা আবদ্ধ করতে চান না কেন, রবীন্দ্রনাথ নিজে এর কোনো বিভাজনেই স্বস্তি পাননি। 'রক্তকরবী'র আদি নাম ছিল 'যক্ষপুরী'– যেখানে নির্ধনের ধন কেড়ে বেড়ে উঠেছিল পুঁজির পাহাড়। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষ্যে– ধনতন্ত্র যতই আধুনিক হোক না কেন, তার চেয়েও শ্রেয়তর সমাজের অন্বেষণেই মানব সমাজের পরিণতি। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, পুঁজিবাদ চলছে যন্ত্রের নিয়মে, পুঁজিবাদী সংগঠনে 'men have become numbers'– মানুষেরা পরিণত হয়েছে 'কিছু সংখ্যার সমষ্টিতে' কেবল। 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গে লেখকের টিকা-ভাষ্যে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, পুঁজিবাদে 'দ্য পার্সোনাল মেন ইজ নট ডেড, অনলি ডোমিনেটেড, বাই দ্য অর্গানাইজড মেন'। ব্যক্তির বিলয়ের আরেক দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি দেখছেন তিনি রুশী সমাজতন্ত্রে গিয়েও। সেখানেও তার উপলব্ধি– মানুষের সম্পূর্ণ মুক্তি মেলেনি। 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রকাশ করেছেন তাঁর চরম উদ্বেগের কথা– সেসব সমালোচনা তৎকালীন পার্টির পক্ষে যায়নি। স্তালিন এসব সমালোচনা সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। ঐ সাক্ষাৎকারও তাঁর জীবদ্দশাতে প্রকাশ প্রায়নি রাশিয়ায়। আশির দশকে গর্বাচেভ ক্ষমতায় আসার পর কেবল তা প্রথম প্রকাশিত হয়। স্তালিনের আমলে স্তালিন পন্থার আদি সমালোচনাগুলোর মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের এই সাক্ষাৎকার।

রাশিয়ায় গিয়ে যা তার ভালো লেগেছিল– যা না দেখলে তাঁর 'এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত'– তা নিয়ে এখানে নতুন করে বলার কিছু নেই। এখানে যেটা লক্ষ্য করার, রাশিয়ার পরেও তাঁর তীর্থদর্শন অসমাপ্তই থেকে গিয়েছিল। গণশিক্ষা, চাষাবাদের আধুনিক কৃৎকৌশল ও যৌথপদ্ধতি, নারীদের জাগরণ, পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর উত্থান, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির লোপ, এসব তিনি অকুণ্ঠভাবে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন 'রাশিয়ার চিঠি'তে। বিরাগভাজন হতে পারেন জেনেও সেসব স্মরণ করেছেন রাশিয়ার পরপরেই আমেরিকা সফরে গিয়েও [রাশিয়ার চিঠির একটি বড় অংশই আমেরিকা সফরে গিয়ে লেখা]। কিন্তু রাশিয়ার নতুন ব্যবস্থায় যেসব ত্রুটি তার চোখে পড়েছিল সে সবও তিনি বলেছেন– যত-না বলেছেন সে সব আমেরিকায় গিয়ে, তার চেয়ে বেশি বলেছেন রাশিয়াতে বসেই, এবং পরবর্তীতে দেশে এসেও। যদিও প্রকাশ্যে তার সামান্যই আলোচনায় এনেছেন। তাঁর সেদিনের মূল্যায়ন ছিল অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ– যা সোভিয়েত-বিপর্যয়ের দুই দশক পরে আজকের দিনে এসেও বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না। বিশেষভাবে তাকে চিন্তিত করেছিল স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা, ব্যাষ্টিক ও সমষ্টিগত সীমার মধ্যে ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা। বুখারিনের 'ধীরে চলা' ও স্তালিনের 'চটজলদি' সমাজতন্ত্র গড়ার এ দুই ভাবনার মধ্যে জোর বিতর্ক চলছিল তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়নে। রবীন্দ্রনাথ আদর্শিক এই পার্টি-বিতর্কের সঙ্গে সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। 'নেশন বনাম নো-নেশন বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে [প্রথমা ২০১২] আমি এ নিয়ে ইতিপূর্বে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছিলাম। এখানে আমি সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি বনাম সমাজের সীমা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভিন্নমতের অবস্থানটির বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

'রাশিয়ার চিঠি'তে বিভিন্ন প্রগতিশীল সংস্কারের স্মৃতিচারণ করার মাঝখানে হঠাৎই এক জায়গায় সুর বদলে পায় তাঁর। প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবেই তিনি বলে উঠলেন [পাঠককে কিছুটা অপ্রস্তুত রেখেই] : 'যাই হোক, মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমতো ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্টদেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায়, ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না। ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয়, তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে।' 'জবরদস্ত লোক' মানে স্তালিনের একনায়কত্ব চলছে– এ কথা বলার পর তিনি ব্যাখ্যা দিলেন কেন এ ধরনের একনায়কত্ব সমূহ দুর্বিপাক ডেকে আনতে পারে : 'এই রকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভালো ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না। উপযুক্তমত নায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।' গণতন্ত্রহীন সমাজতন্ত্র যে সোনার পাথর বাটির মতো এটাও বলতে পারতেন তিনি। কিন্তু সেদিকে আর অগ্রসর হলেন না তিনি। স্তালিনের সমালোচনাটি– এবং সেই সূত্রে আমলাতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মতাদর্শগত বিচার– যেন ইচ্ছে করেই মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। কেননা এসব যখন লেখা হচ্ছে তার ঠিক পরের স্তবকেই তাঁর মনে হলো– পরিত্রাণের রাস্তা এখনও হয়তো সেখানে খোলা আছে : 'যদিও সোভিয়েত নীতি-প্রচার সম্বন্ধে এরা যুক্তির জোরের উপরেও বাহুবলকে খাড়া করে রেখেছে। তবুও যুক্তিকে একেবারে ছাড়েনি।' এবং এই যুক্তির 'স্পেস' থেকে যাওয়ার কারণেই তখনও পর্যন্ত তাঁর মনে হয়েছে বুঝি 'এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল'। এসব যখন লেখা হচ্ছে তখনও রবীন্দ্রনাথের জানা সম্ভব ছিল না ১৯৩৬, ১৯৩৮, ১৯৪০ সালের ভিন্নমত দলনের জন্য সংগঠিত স্তালিনীয় শো-ট্রায়ালগুলোর কথা। পরবর্তী সময়ে সে সবের সংবাদও তার কাছে এসে পৌঁছেছে। তার পরও তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস হারাননি পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে নতুন এ সমাজের সম্ভাবনা সম্পর্কে। এ নিয়ে ভেতরে হয়তো রক্তক্ষরণ হয়েছে তাঁর, কিন্তু ঔপনিবেশিক-পুঁজিবাদের শাসনে থেকে সোভিয়েত বিরোধিতার দলে নাম লেখাতে সায় ছিল না শেষাবধি। মানবেন্দ্র রায়ের মতো ভিন্ন মতাবলম্বীদের থেকে এখানে তার দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্ন ঝোঁক ধরা পড়ে। হিটলারের জার্মানি যখন মস্কোর উপকণ্ঠে, উদ্বেগের সীমা ছিল না তাঁর এই নতুন রাষ্ট্রের পরিণতি নিয়ে। পরে যখন রোগশয্যায় শুয়ে শুনলেন সোভিয়েত বাহিনী ক্রমেই সংগঠিত হয়ে সফল প্রত্যাঘাত করে চলেছে তখন বলে উঠেছিলেন 'পারবে, ওরাই পারবে।' সে তথ্য আমরা ইতিমধ্যেই বিস্তৃত শুনেছি চিন্মোহন সেহানবীশের এ বিষয়ে একাধিক আলোচনার মধ্য দিয়ে।

৭. উপসংহার

সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এ ছোট দাদু তার নাতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এ রকম একটি বাক্যে– 'আর যা-ই

ORION GROUP

হও, কূপমণ্ডুক হয়ো না'। এ কথা সত্যজিৎ জীবনসায়েহ্নে এসে গোটা বাঙালি ভদ্রসম্প্রদায়কে উদ্দেশ করেই বলেছিলেন। মুক্তবুদ্ধির ভিন্নমত চর্চায় আস্থা হারিয়ে ফেলা আজকের মধ্যবিত্ত-উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী আত্মনির্ভরতার পরিবর্তে যক্ষপুরীর অংশীদার হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। রবীন্দ্রনাথ এই মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ পরিণতির শুরুটা দেখে গিয়েছিলেন।

'লেখন' কাব্যগ্রন্থের এক জায়গায় তিনি বলেছেন : 'আলোকের সাথে মেলে আঁধারের ভাষা, মেলে না কুয়াশা।' রবীন্দ্রনাথ বাঁধা মতের বাইরে গিয়ে এই কুয়াশাকে অতিক্রম করতে বলেছেন উন্মুক্ত ও সহনশীল তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে। নিজের বাঙালিত্ব পরিচয়কে জাতীয়তাবাদী নিরিখে সভার উর্ধ্বে তুলে ধরতে চাননি কখনোই : 'মানুষের পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম ও মানুষের পৃথিবী হইতে বিদায় লাইলাম। আমি বাঙালি হইয়া ঠাকুরবাড়িতে আসিয়াছি এই ত আমার শেষ কথা নহে।' পার্টিশন নিয়ে, বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিয়ে, জাতীয়

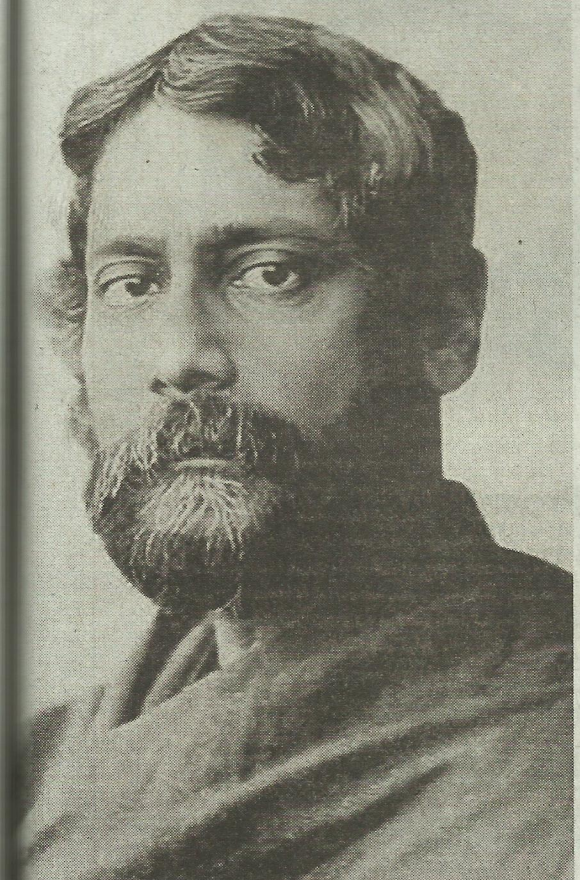

মধ্যবয়সে

ইতিহাসের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা-বিচার নিয়ে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-পরিচয় নিয়ে, ব্রাহ্ম-হিন্দু তর্ক নিয়ে, হিন্দু-মুসলমান ভেদ-বিচার নিয়ে, প্রথাগত সমাজতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা নিয়ে, পুঁজিবাদের নির্মম সমালোচনায় তিনি ধারাবাহিকভাবে চলতি মতের বাইরে গিয়ে নিজের বিচার-বিবেচনাকে তুলে ধরেছেন। এ জন্যে তার কাছের মানুষ গান্ধীকেও ঠুকতে ভোলেননি। বিহারের ভূমিকম্প নিয়ে গান্ধীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে গিয়ে প্রবলভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, 'প্রাকৃতিক উৎপাতের জন্যে মানুষের পাপ-পূণ্যকে দায়ী করবার মতো মনোভাব আমার নয়।' এই যে ক্রমাগতভাবে সামাজিক ডিসকোর্সে, বয়ানে ও বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে নিজের মতো ও বিশ্বাসকে কঠোরভাবে যাচাই করে নেওয়া, প্রয়োজনে যে কোনো শাসক [ডোমিন্যান্ট] মতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সৎসাহস দেখানো– সে শাসকমত যত প্রবল ও যে-পক্ষেরই হোক না কেন, এবং এর ফলে যত ধরনেরই বাইরের ও ভেতরের পীড়া ও পীড়ন তাকে সইতে হোক না কেন– এই যে বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান– একেই আমরা বলতে চেয়েছি ভিন্ন মতাবলম্বীর পথ, বিপজ্জনক প্রায় নিঃসঙ্গ চলার পথ।

শেষ পর্যন্ত কি রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ যুক্তিবাদী মনোভঙ্গিকে আমাদের পুরো সমাজ, আমাদের বিদ্বৎসমাজ বুঝতে পেরেছিলেন? রবীন্দ্রনাথ নিজে মনে করতেন যে এ কাজে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। হেমন্তবালাকে লেখা একটি চিঠিতে বলেছেন, 'দীর্ঘকাল এই কাজ করে এসেচি– দেশের লোকের কাউকে কিছু বোঝাতে পেরেচি বলে বিশ্বাস করি নে– কথায় বুঝিয়েচি কিন্তু অন্তরে নয়। সেই জন্যে আমার স্বদেশে আমি একা।' তার সমসাময়িকের অনেক প্রাতঃস্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই তার সমাজ-চিন্তার নানা দিকের সমালোচনায় মুখর ছিলেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন : 'সজনীর চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো লোক আমাকে নিরন্তর আঘাত করেচে– যথা দ্বিজু রায়, চিত্তরঞ্জন, সুরেশ সমাজপতি।' এই দলে তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কেও কোনো এক সময় দেখে থাকবেন। হেমন্তবালার কাছে লেখা চিঠিতে তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, 'সুনীতির সমাজ মতের সঙ্গে আমার বিরোধ থাকাতে তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন যে আমি হিন্দু সমাজের শত্রু– অতএব কঠিন শাস্তির যোগ্য!' অন্যত্র বলেছেন, 'দেশে আমার নিন্দা ব্যবসায়ের ঘুমন্ত সরিক তোমরা সবাই' বা আরও তীব্রভাবে– 'তোমাদের সমাজের দিক থেকে আমি ব্রাত্য, আমি একঘরে, আমি অস্পৃশ্য।' হেমন্তবালাকে লেখা এসব চিঠির সমসাময়িক কালেই লেখা হয়েছিল পত্রপুটের পনেরোতম সেই বিখ্যাত কবিতাটি, যেখানে ফিরে আসে 'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন' চরণ দুটি। অন্যত্র পরিহাসছলে বলেছেন, মনের কথাটি : 'কোনো ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দীক্ষা দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। কেননা আমি নিজেই যূথভ্রষ্ট, আমি ধর্ম্মসমাজের তকমাপরা ছাপ-মারাদের মধ্যে কেউ নই,– রাজার দত্ত উপাধি আমি ত্যাগ করেছি সম্প্রদায়ের দত্ত উপাধিও আমার নেই।'

তবে একলা-চলার এই পথ নিয়ে তাঁর নিজের মনে কোনো সংশয় ছিল না। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে য়ুরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট যুগের ভলতেয়ার-রুশো-দিদেরো প্রমুখ পুরোধা চিন্তকের মতোই সাহসী যোদ্ধা বলে মনে হয়। শুধু সৃষ্টিশীল প্রতিভার বিচারেই অতি-মানবিক উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন তা-ই নয়, সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এক নিঃসঙ্গ লড়াকু যোদ্ধা। ঈশ্বরচন্দ্র যেমন ঈশ্বর ছিলেন না বাস্তবিক এবং বিধবা প্রচলন/বহু-বিবাহ রোধের আন্দোলনের সময় তার প্রতি ছোড়া ঢিলগুলো যেমন তাঁর গায়ে লেগেছিল এবং ব্যথা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথও তার চিঠিপত্রে ভিন্নমতের অবস্থান তুলে ধরবার সময়ে তার প্রতি নানা দিক থেকে ছোড়া ঢিলগুলোর ব্যথা-বেদনার কথা তুলে ধরেছিলেন। তবে তাতে করে রণে ভঙ্গ দেওয়ার কথা ভাবেনি তিনি : 'প্রথম প্রথম তা নিয়ে মনে খেদ করেচি– এখন বুঝেচি আমার যা কর্ম্ম তা করেচি। তার পরেকার উপসংহার আমার হাতে নয়।' আর নগেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'আমার নিজের জীবনের সাধনায় আমি চিরদিনই প্রায় সঙ্গীহীন, সঙ্গী কয়েক দিনের জন্যে পেলেও বরাবরের মত পাই নে– সঙ্গের বাতি নিবিয়ে দিয়ে বারেবারে আমি একলা ঘরের অন্ধকারে নিজের বাতি জ্বালবার চেষ্টায় এতদিন কাটিয়েচি– এমনি করেই শেষ পর্যন্ত কাটবে।' পরবর্তীতে জাতি জাতি করে পাড়া মাত করা বাঙালি তাকে কখনও গুরুদেব, কখনও ঋষির আসনে বসিয়েছিল; কিন্তু ভিন্নমতের কারণে রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গ লড়াকু অবস্থানে কখনোই রদবদল হয় নি। তিনি নিজেকে যূথভ্রষ্ট, সমাজের বাইরের অন্ত্যজ জন হিসেবে, ভিড়ের বাইরের দূরবর্তী প্রান্তে, পথের এক ধারেই রেখে দিয়েছিলেন। ■

ORION GROUP